بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৩ মার্চ ২০১২)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৩ মার্চ ২০১২-এর (২৩ আমান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য অত্যন্ত আনন্দঘন ও কল্যাণময় একটি দিন যার সাথে জুমুআর কল্যাণও একীভূত হয়েছে। কেননা ১২৩ বছর পূর্বে আজকের দিনে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এর সকল অনুসঙ্গ সহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগ মাহদীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং বয়আতের সূচনার মাধ্যমে আখেরীনদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা প্রথম যুগের (সাহাবাদের) সাথে একীভূত হয়েছেন। আর আমরাও সেসব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি যারা এথেকে কল্যাণমন্ডিত।

অতএব প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবী করে তাকে ভালোভাবে এ বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা আমাদের প্রতি একটি গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ইসলামের পুনর্জাগরণের যে কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তা তাঁর (আ.)-এর অনুসারীদের জীবনে এক বিপ্লব সাধনের দাবী করে, যাতে আমরা সেসব কল্যাণ লাভ করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

অতএব প্রতি বছর যখন ২৩ শে মার্চ আসে তখন আমাদের শুধু এজন্য আনন্দিত হবার কিছু নেই যে, আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করছি অথবা আলহামদুলিল্লাহ্ আমরা এ জামাতে অন্তভূর্ক্ত হয়েছি অথবা জামাতের গোড়াপত্তনের ইতিহাস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমূহ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি অথবা জলসার আয়োজন করেছি। এতটুকুই যথেষ্ট নয় অথবা এ সব করাই যে সব কিছু তা নয়। বরং সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের দেখা উচিত বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িতআবলীর কোন্ কোনটি আমরা পালন করছি। আজকের দিন আমাদের পর্যালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসার দিন। বয়আতের পর অর্পিত দায়িত্বাবলীর পর্যালোচনারও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহের উপর প্রণিধানের দিন আর স্বীয় অঙ্গীকার নবায়নেরও দিন। বয়আতের শর্ত সমূহ পালনের চেষ্টায় সংকল্পবদ্ধ হবার দিন। মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ায় যেখানে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ পবিত্রতা ও প্রশংসার গুণগান গাওয়ার দিন সেখানে খোদার প্রিয় (সা.)-এর প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ প্রেরণের দিনও বটে।

অতএব এ বিষয়টির গুরুত্ব সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এ গুরুত্ব বয়আতের শর্তাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার সাথে সম্পৃক্ত। এ বিষয়টিকে স্মরণ করানোর জন্য আজ আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় তিনি আমাদের কাছে কি চান তা বয়আতের শর্তাবলী আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো।

প্রথম শর্ত হল: যার উপর আমল করার অঙ্গীকার আহমদীয়াত গ্রহণকারী করে থাকে তাহলো, **'বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সে শির্ক হতে পবিত্র থাকবে। শির্ক এড়িয়ে চলবে'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'অন্তরে হাজার হাজার মূর্তি লালন করে কেবল মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করাকে তৌহীদ বলে না। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ, পরিকল্পনা, প্রতারণা বা কৌশলকে খোদার মত মর্যাদা দেয়, অথবা কোন মানুষের ওপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে খোদা তা'লার প্রতি ভরসা করা উচিত অথবা নিজ প্রবৃত্তিকে খোদার ন্যায় মর্যাদা দান করে, এসব অবস্থায় খোদা তা'লার নিকট সে এক মূর্তি পূজারী। সোনা রূপা অথবা পিতল দিয়ে বানানো মূর্তি যার প্রতি ভরসা করা হয় মূর্তি বলতে কেবল তাই বুঝায় না বরং প্রতিটি বস্তু, কথা, কর্ম** (অর্থাৎ কোন কথা, কোন বস্তু, কোন কর্ম) **যাকে সেই সম্মান দেয়া হয় যা পাবার একমাত্র যোগ্য হলেন খোদা, তা খোদার দৃষ্টিতে মূর্তি বা প্রতিমা। একথা অবশ্য সত্য যে তওয়াতে এসব সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিশদভাবে উল্লেখ নেই তবে পবিত্র কুরআন সূক্ষ্ম অংশীবাদীতার বিবরণে পরিপূর্ণ। অতএব কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করার মাধ্যমে এই মূর্তিপূজা যা যক্ষার ন্যায় চিমটে ছিলো তা মানুষের অন্তর থেকে দূর করে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। সে যুগে ইহুদীরা এ ধরনের অংশীবাদীতায় নিমজ্জিত ছিল আর তাদেরকে এ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তওয়াতের ছিল না কারণ তওয়াতে এ সূক্ষ্ম শিক্ষা ছিলো না। অন্য কারণ হলো, এ ব্যাধি যা**

সব ইহুদীর মাঝে ছেয়ে গিয়েছিল তা এক পবিত্র তৌহীদের দৃষ্টান্তের দাবী করছিল যা জীবন্তরূপে এক পূর্ণ মানবের মাঝে দৃশ্যমান হবে।

স্মরণ রেখো! প্রকৃত তৌহীদ যার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান এবং যার সাথে সম্পৃক্ত হবার মাঝেই মুক্তি নিহিত তাহলো খোদা তা'লার সত্তাকে প্রত্যেক প্রকার অংশীবাদীতা' হোক তা মূর্তি বা মানুষ' 'চাঁদ অথবা সূর্য' 'নিজের প্রবৃত্তি' অথবা স্বীয় পরিকল্পনা, চালাকী বা ধূর্ততা হতে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁর বিপরীতে কাউকে শক্তিমান বলে জ্ঞান না করা রিযিকদাতা মনে না করা, কাউকে সম্মানদাতা ও লাঞ্ছনাকারী বলে মনে না করা। (অর্থাৎ কাউকে এই মনে না করা যে সে সম্মানদাতা অথবা লাঞ্ছনাকারী বরং খোদা তা'লাই সম্মান দেন এবং লাঞ্ছিত করেন।) **কাউকে সাহায্যদাতা বা সাহায্যকারী বলে মনে না করা। দ্বিতীয়তঃ নিজ ভালবাসাকে শুধু তাঁর জন্যই বিশুদ্ধ করা, নিজ ইবাদতকে তাঁর জন্য নিবদ্ধ করা নিজ বিনয় তাঁর জন্য নিবেদন করা। আশা-ভরসা তাঁর মাঝেই নিবদ্ধ রাখা, কেবল তাঁকে ভয় করা। অতএব এ তিন বিশেষত্বহীন তৌহীদ পরিপূর্ণ হতে পারে না'।** (তিন প্রকার বিশেষ বিষয়গুলো কি কি?)

তিনি (আ.) বলেন, **'প্রথমত সত্তার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ তাঁর স্বত্তার বিপরীতে সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন জ্ঞান করা।** (যা কিছু পৃথিবীতে আছে সেগুলিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা)। **সব কিছুকে লয়শীল ও অন্তঃসারশুন্য মনে করা।** (প্রতিটি বস্তু লয়শীল নিজ সত্তায় কোন মূল্য রাখে না। বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর কোন অর্থ নেই। আল্লাহ্ তা'লার সামনে সব কিছুই অলীক) **দ্বিতীয়তঃ গুণাবলীর দিক হতে তৌহীদ অর্থাৎ রবুবীয়্যত (লালন পালনকারী) ও উলুহিয়্যাত (উপাস্য)-এর গুণাবলী সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো প্রতি আরোপ না করা।** (অর্থাৎ প্রতিপালনকারী হলেন কেবলমাত্র আমাদের খোদা। তিনিই আমাদের লালন-পালনকারী তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সকল শক্তির উৎস) **বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিপালনকারী ও কল্যাণদাতা দেখা যায়।** (বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিপালনকারীদের দেখা যায় যাদের দ্বারা আমরা উপকৃত হই) **এসব তাঁর-ই প্রদত্ত এক বিধান বলে বিশ্বাস করা।** (অর্থাৎ যে সব লোক দ্বারা আমরা উপকৃত হচ্ছি আমরা এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার কারণেই পাচ্ছি। এ সব আল্লাহ্ তা'লার বিধানের অংশ) **তৃতীয়তঃ নিজ ভালবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দিক থেকে তৌহীদ অর্থাৎ দাসত্বের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন ভালবাসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে খোদা তা'লার শরীক না করা। তাঁর মাঝেই বিলীন হওয়া।**

বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত হল: 'মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও কদাচার অন্যায়, অসাধুতা আর বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে বিরত থাকবে এবং প্রবৃত্তির তাড়না যত প্রবলই হোক না কেন এর বশবর্তী হবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ প্রবৃত্তির সে সকল তাড়না থেকে মুক্ত না হবে যা সত্য বলার পথে অন্তরায় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে সত্যভাষী বলে বিবেচিত হবে না। কেননা মানুষ যদি কেবল এমন ক্ষেত্রে সত্য বলে যেখানে তার কোন ক্ষতি হয় না অর্থাৎ নিজ সম্মান অথবা সম্পদ বা জীবনের হুমকির ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে**

বসে এবং সত্যকে এড়িয়ে চলে তাহলে উম্মাদ বা শিশুদের তুলনায় তার কি-ই বা শ্রেষ্ঠত্ব'।

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কোন ধরনের স্বার্থ ছাড়া অযথা মিথ্যা বলবে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই। অতএব এমন সত্য যা কোন ক্ষতির আশংকায় বিসর্জন দেয়া হয় তা কোন ভাবেই প্রকৃত সচ্চরিত্রের মাঝে গণ্য হতে পারে না। সত্য বলার যথাযথ স্থান, কাল সেটিই যখন নিজের জীবন অথবা সম্পদ অথবা সম্মান পদদলিত হবার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে খোদা তা'লার শিক্ষা হল,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১)

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (সূরা আল্ বাকারা: ২৮৩)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (সূরা আল্ বাকারা: ২৮৪)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (সূরা আল্ আন'আম: ১৫৩)

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (সূরা আন্ নিসা: ১৩৫)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا (সূরা আন্ নিসা: ১৩৫)

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ (সূরা আল্ আহযাব: ৩৬)

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (সূরা আল্ আসর: ৪)

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৩)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, প্রতিমাসমূহের পূজা এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো অর্থাৎ মিথ্যাও এক প্রকার মূর্তিস্বরূপ যার প্রতি নির্ভরকারী খোদার প্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগ করে। তাই মিথ্যা বলার ফলে খোদাকেও হারাতে হয়। যখন তোমাদেরকে সত্য সাক্ষীর জন্য আহ্বান করা হয় তখন সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করবে না এবং সত্য সাক্ষ্যকে গোপন করবে না আর যে এমনটি করবে তার হৃদয় পাপী। যখন তোমরা কথা বলবে তখন সে কথাই কেবল বলবে যা প্রকৃতই সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তা তোমাদের কোন নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানই হোক না কেন। সত্য এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর তোমাদের প্রত্যেকটি সাক্ষ্য যেন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে হয়। যদি সত্য বলার ফলে তোমাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে অথবা এর ফলে যদি তোমাদের মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও মিথ্যা বলবে না। কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে সত্য সাক্ষ্য প্রদানে যেন বিরত না রাখে। সত্যবাদী নারী-পুরুষ উভয়ে বড় বড় পুরস্কার লাভ করবে। তাদের (অর্থাৎ সত্যভাষী নারী-পুরুষের) অভ্যাস এরূপ যে তারা অন্যদেরকে সত্য বলার সদুপদেশ দেয় এবং তারা মিথ্যার আসরে আসন গ্রহণ করে না'।

এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) আরো বলেন, 'দ্বিতীয় শর্তের মাঝে অনেক কথা অন্তর্ভূক্ত। ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। অর্থাৎ এমন আসর থেকেও দূরে থেকো যার দ্বারা এমন চিন্তা সৃষ্টি হতে পারে। আর এমন পথ অবলম্বন করবে না যে পথে চলার ফলে এ পাপের আশঙ্কা থাকে। যে ব্যভিচার করে সে নোংরামির সীমা ছাড়িয়ে যায়। (বর্তমানে যে সব টিভি

প্রোগ্রাম হয়, বিভিন্ন চ্যানেল রয়েছে, কতক আবার ইন্টারনেটেও আসে, এ সবকিছু এমন জিনিস যা এ নোংরামির প্রতি আকর্ষণ করে। চোখের ব্যভিচার বলতেও কিছু আছে, এর থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক এমন জিনিস যা মন্দের দিকে নিয়ে যায় তা এড়িয়ে চলো। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ অর্থাৎ এটি কাঙ্খিত গন্তব্যে বাঁধা প্রদান করে এবং তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্য এটি খুবই ভয়ংকর। তোমাদের গন্তব্য কি হওয়া উচিত? আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং এটিই অন্তিম গন্তব্য আর এ পথে ঐ সকল বিষয় বাধ সাধে।)

এরপর দ্বিতীয় শর্তে অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্গত হলো, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কু-দৃষ্টি'। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'কুরআন শরীফ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা এবং দুর্বলতা সমূহকে দৃষ্টিতে রেখে অবস্থানুযায়ী শিক্ষা প্রদান করে, কতইনা উত্তম পথ অবলম্বন করেছে,** قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ (সূরা আন্ নূর: ৩১) **অর্থাৎ তুমি মু'মিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের ছিদ্র সমূহের সুরক্ষা করে। এটি এমন এক কর্ম যদ্বারা তাদের আত্মশুদ্ধি লাভ হবে। 'ফুরুজ' দ্বারা কেবল লজ্জাস্থানকেই বুঝায় না বরং প্রত্যেক ছিদ্র যেমন কান ইত্যাদিও এর অন্তর্ভূক্ত। আর এক্ষেত্রে না মাহরাম মহিলাগণ** (অর্থাৎ এমন মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) **তাদের গানবাজনা ইত্যাদি শুনতে বারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু স্মরণ রেখো! হাজার হাজার অভিজ্ঞতা দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, যে সকল বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেন অবশেষে মানুষকে তা থেকে বিরত হতেই হয়'।**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'বাছ বিচারের আচরণ বিধি বা শর্তসমূহ ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্য আবশ্যক করেছে। মহিলাদেরকে যেখানে পর্দার আদেশ প্রদান করা হয়েছে সেখানে একইভাবে পুরুষদেরকেও এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চোখ অবনত রাখা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য, খোদা তা'লার আদেশাবলীর বিপরীতে নিজ অভ্যাস, রীতি-নীতিকে পরিত্যাগ করার বিষয়াবলী এমন বিধান যেক্ষেত্রে ইসলামের দরজা অতি সঙ্কীর্ণ আর এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তি এ দরজায় প্রবেশ করে না'।**

পাপাচার ও কাদাচার এড়িয়ে চলার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যখন এরা** (অর্থাৎ মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা) **পাপাচারে সীমাতিক্রম করছিল আর খোদা তা'লার আদেশাবলীর অসম্মান ও আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবজ্ঞা তাদের হৃদয়ে স্থান করল, ইহকাল ও এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়ল তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) একইভাবে, হালাকু, চেঙ্গিস খাঁনদের দ্বারা ধ্বংস করিয়েছেন। লেখা আছে যে, সে সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসতো "আইয়ূহাল কুফ্ফারুকতুলুল ফুজ্জার" অর্থাৎ হে কাফিরগণ! পাপাচারীদেরকে হত্যা করো। মোটকথা পাপাচারী-কদাচারী খোদার দৃষ্টিতে অস্বীকারকারীদের তুলনায় অধিক লাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য বলে পরিগণিত।**

অতঃপর বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **'সেসব লোক যারা কেবলমাত্র খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত জামাতর্ভূক্ত হবার কারণে তোমাদেরকে পরিত্যাগ**

করে এবং তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে, তাদের সাথে তোমরা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও সেই অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। তোমরা নিজেদের পবিত্র আদর্শ এবং উত্তম চাল-চলনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছ। স্মরণ রাখবে! তোমাদেরকে বারংবার এ উপদেশ দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি যে, সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদের স্থানকে এড়িয়ে চল আর গালমন্দ শুনলেও ধৈর্য ধারণ কর। উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মন্দের প্রতিউত্তর দাও আর যদি কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয় সেক্ষেত্রে এমন স্থান থেকে প্রস্থান কর এবং নম্রতার সাথে উত্তর দেয়াই শ্রেয়।

আমি যখন শুনি, এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি কারো সাথে ঝগড়া করেছে, এমন আচরণকে আমি আদৌ পছন্দ করি না এবং যে জামাত বিশ্বে একটি অনুপম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা সেই জামাত তাক্বওয়া বিবর্জিত পথ অবলম্বন করুক তা খোদা তা'লাও চান না। উপরন্ত আমি তোমাদেরকে এ-ও বলে দিচ্ছি, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা এত জোর দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি এই জামাতের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যদি ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রেখে কাজ না করে সে যেন মনে রাখে, সে এই জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাকে যে নোংরা গালি দেয়া হয় তা চরম ক্রোধ ও উত্তেজনার কারণ হতে পারে কিন্তু (আমি বলব) এই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দাও তোমরা এর বিচার করতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। তোমরা এ সমস্ত গালি শুনেও ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখবে। (পাকিস্তানে আহমদীদের এটিই বারবার বলা হয় কেননা, সেখানে লোকেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নোংরা গালি দেয়ার ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর একমাত্র সমাধান হলো, দোয়া এবং অধিকহারে দোয়া করা)।

এরপর তিনি (আ.) প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে বলেন, 'সেই কথা মান্য করো যার স্বপক্ষে জ্ঞান ও বিবেক সায় দেয় আর যা সম্পর্কে খোদা তা'লার গ্রন্থাবলীও একমত। তিনি বলেন, ব্যভিচার করো না, মিথ্যা বলো না, কু-দৃষ্টি দিও না এবং সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ, অন্যায় ও প্রতারণা, নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাক। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরাভূত হয়ো না এবং পাঁচ বেলার নামায পড়। কেননা মানুষের স্বভাবে পাঁচ ভাবেই পরিবর্তন এসে থাকে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর কেননা, তিনিই চরম অমানিসার পর নতুনভাবে খোদা লাভের পথ দেখিয়েছেন।

এরপর বয়আতের তৃতীয় শর্ত হলো: 'বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল করীম (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, প্রত্যহ নিজ পাপ সমূহের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে প্রত্যহ তাঁর গুণ কীর্ত্তণ করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'হে সেই সমস্ত লোক! যারা নিজেদেরকে আমার জামাতের সদস্য বলে মনে কর, আকাশে তোমরা তখনই আমার জামাত হিসাবে গণ্য হবে যখন তোমরা সত্যিকার অর্থে তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করবে। তাই নিজেদের পাঁচ বেলার নামায এমন ভীতি ও আত্মবিলীনতার সাথে পড় যেন তোমরা খোদা তা'লাকে প্রত্যক্ষ করছ এবং তোমাদের রোযাসমূহ খোদা তা'লার জন্য সততার সাথে পূর্ণ কর। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে যাকাত আদায়ের যোগ্য সে যেন যাকাত দেয় এবং যার উপর হজ্জ্ব আবশ্যক হয়েছে আর এতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই সে যেন হজ্জ্ব করে। প্রত্যেক পুণ্য কাজ যথাযথ ভাবে প্রতিসম্পাদন কর এবং মন্দকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় স্মরণ রেখো! তাক্বওয়া বিবর্জিত কোন কাজই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছতে পারে না। প্রত্যেক পুণ্যের মূল হলো তাক্বওয়া। যে কাজে এই মূল নষ্ট হবে না সেই কাজও বিনষ্ট হবে না'।**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'নামায এমন জিনিস যার এর মাধ্যমে ঊর্ধ্বলোক মানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ে** (অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানা হয় বা প্রাপ্য দেয়া হয় আল্লাহ্ তা'লা অতি নিকটে এসে যান) **যে প্রকৃত অর্থে নামায পড়ে সে মনে করে, আমি মরে গেছি এবং তার আত্মা বিলীন হয়ে খোদার দোরগোড়ায় সেজদাবনত থাকে। যে ঘরে এ ধরনের নামায হবে সেই ঘর কখনও ধ্বংস হবে না। হাদীসে আছে, যদি নূহ-এর যুগে নামায থাকতো তাহলে সেই জাতি কখনও ধ্বংস হতো না। হজ্জ্ব, রোযা, যাকাত মানুষের জন্য শর্ত সাপেক্ষ কিন্তু নামায শর্তযুক্ত নয়; সবগুলো বছরে একবার করে পালনীয় কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে প্রতিদিন পাঁচবার পড়ার নির্দেশ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত নামায যথাযথভাবে পড়া হবে না ততক্ষণ সেই কল্যাণরাজিও লাভ হবে না যা এর মাধ্যমে লাভ হয় এবং এই বয়আতের কোন উপকারই সাধিত হবে না'।**

এরপর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **'রাতে উঠো এবং দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পথ দেখান। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণও ধীরে ধীরে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তারা প্রথমে কী ছিলেন? কৃষকের বীজ বপনের মত ব্যাপার ছিল। এরপর মহানবী (সা.) পানি সিঞ্চন করেছেন, তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন। বীজ উন্নত ছিল, জমি উর্বর ছিল তাই এই পানি সিঞ্চনে ভাল ফল এসেছে। মহানবী (সা.) যেভাবে হাঁটতেন তারাও সেভাবে হাঁটতেন। তারা দিন বা রাতের অপেক্ষা করতেন না। তোমরা সত্য অন্তকরণে তওবা করো, তাহাজ্জুদে উঠো, দোয়া করো, আত্মসংশোধন করো, দুর্বলতা পরিহার করো এবং নিজেদের কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করো'।**

এরপর তিনি (আ.) দরূদ সম্পর্কে বলেন, **'মানুষ প্রকৃতপক্ষে বান্দা বা দাস। দাসের কাজ হলো, মালিক যে নির্দেশ দেয় তা শিরোধার্য করা। তেমনিভাবে তোমরা যদি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ লাভ করতে চাও তাহলে তার দাস হয়ে যাওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,** قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (সূরা আয্ যুমার: ৫৪) **এখানে বান্দা বলতে দাসই বুঝানো হয়েছে, পুরো সৃষ্টিকূল নয়। রসূল করীম (সা.)-এর দাস হবার**

জন্য আবশ্যক, তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা এবং তাঁর কোন হুকুম অমান্য না করে সকল আদেশ পালন করা'।

এরপর ইস্তেগফার সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্নিধান হতে শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ ইস্তেগফার করে তাহলে রূহুল কুদুস বা ফিরিশ্‌তার সাহায্যে তাদের দুর্বলতাসমূহ দূর হতে পারে এবং তারা পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। যেভাবে আল্লাহ্‌র নবী ও রসূলগণ রক্ষা পেয়ে থাকেন। যারা গুনাহ্‌গার হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের উপকারিতা হলো, তারা পাপের অশুভ পরিণাম অর্থাৎ শাস্তি হতে রক্ষা পায়। (ভুলবশতঃ গুনাহ্‌ হয়ে গেলে ইস্তেগফার করার ফলে এই গুনাহ্‌র কুফল হতে মানুষ রেহাই পায়, আল্লাহ্‌ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।) কেননা আলো আসলে অন্ধকার অবশিষ্ট থাকতে পারে না। যেসব অপরাধী ইস্তেগফার করে না অর্থাৎ খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে না তারা নিজেদের অপরাধের শাস্তি পেতে থাকে'।

এরপর চতুর্থ শর্ত হলো: 'প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে হাত, জিহ্বা বা অন্য কোন উপায়ে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবে না'।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেন, 'এর মাঝে প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, মার্জনা বা ক্ষমা করা অর্থাৎ কারো অপরাধ ক্ষমা করা। এতে করে যে অর্থে হিতসাধন হয় তা হলো, যে গুনাহ্‌ করে সে এক প্রকার ক্ষতি সাধন করে এবং এর ফলে সেও শাস্তি পাওয়া বা কারারুদ্ধ হওয়া এবং জরিমানার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। অথবা সে এমন হয়ে থাকে যে মানুষ স্বয়ং তার বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে। অতএব তাকে ক্ষমা করে দেয়া সমিচীন হলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া তার হিতসাধনের নামান্তর। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (সূরা আলে ইমরান:১৩৫)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (সূরা আশ্‌ শূরা:৪১)

অর্থাৎ প্রকৃত পুণ্যবান তারা যারা ক্রোধের পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং ক্ষমার স্থলে অপরাধ ক্ষমা করে। মন্দের প্রতিদান ততটুকুই যতটুকু মন্দ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে যেখানে ক্ষমার ফলে তার ক্ষতি নয় বরং সংশোধন হয় অর্থাৎ যথাযথ স্থানে হতে হবে অপাত্রে যেন না হয় (অর্থাৎ ক্ষমা করা যেন লাভ জনক হয়) তাহলে এর উত্তম প্রতিদান পাবে'।

এরপর আরো বলেন, 'মানুষের উচিত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, নির্লজ্জ আচরণ, সৃষ্ট জীবের সাথে অসদাচরণ করা থেকে বিরত থাকা। ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। কঠোরতা ও নম্রতা স্থানকালভেদে প্রদর্শন করা উচিত'।

এরপর বিনয়াবলম্বন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'ঐশী শাস্তি এসে তওবার পথ বন্ধ করে দেয়ার পূর্বেই তওবা করো। যখন জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে এত ভয়ভীতি দেখা যায় সেখানে খোদা তা'লার আইনকে ভয় না করার কী কারণ থাকতে পারে। বিপদ যখন মাথার উপর এসে যায় তখন এর স্বাদ গ্রহণ করতেই হয়। প্রত্যেকের তাহাজ্জুদে উঠা এবং পাঁচ বেলার নামাযে কুনুত যোগ করা উচিত। প্রত্যেকের এমন বিষয় পরিহার করা উচিত যা

খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এবং তওবা করা উচিত। তওবার অর্থ হলো, সকল মন্দ কাজ এবং খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন প্রত্যেক কাজ পরিহার করে নিজের মাঝে এক প্রকৃত পরিবর্তন আনয়ন করা আর সামনে অগ্রসর হওয়া আর তাক্বওয়া অবলম্বন করা। এর ফলেও খোদার দয়া বা কৃপা লাভ হয়। মনুষ্য স্বভাবগুলোকে শালীনতার গন্ডিভূক্ত করা উচিত। (মানব স্বভাবকে সচ্চরিত্র দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করো) **ক্রোধের স্থান যেন বিনয় ও নম্রতা নিয়ে নেয়। আখলাকের সংশোধনের পাশাপাশি সামর্থ অনুযায়ী সদকাও দাও।** وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌র:৯) **অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবীদেরকে, এতীমদেরকে এবং বন্দীদেরকে খাবার প্রদান করে এবং বলে, আমরা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে থাকি এবং আমরা সেই দিনকে ভয় করি যা অত্যন্ত ভয়াবহ। মোটকথা দোয়া ও তওবার ভিত্তিতে কাজ করো এবং সদকা দিতে থাকো যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা ও করুণার ব্যবহার করেন'।**

এরপর **পঞ্চম শর্ত হলো: 'সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পিছপা হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে'।** (আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'অর্থাৎ মানুষের মাঝে উন্নত মানের মানুষ সে-ই যে খোদা তা'লার ইচ্ছায় বিলীন হয়ে যায়, সে তার জীবন বিকিয়ে দিয়ে বিনিময়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টিকে ক্রয় করে।** (অর্থাৎ নিজের জীবন বিক্রি করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ক্রয় করে, নিজের জীবনের কোন পরওয়া করে না)। **তারাই সেসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে। খোদা তা'লা এই আয়াতে বলছেন,** (এই আয়াত উল্লেখ করা হয় নি কিন্তু যাহোক আয়াতের তিনি তফসীর বর্ণনা করছেন) **সেই ব্যক্তি সকল দুঃখ-গঞ্জনা হতে পরিত্রাণ লাভ করে যে আমার রাস্তায় আমার সন্তুষ্টির পথে নিজের জীবন বিক্রি করে এবং প্রাণান্তকর সাধনার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, স্বীয় পুরো সত্তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তা সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য এবং সৃষ্টির সেবার জন্য বানানো হয়েছে'।**

এরপর তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভের প্রেক্ষাপটে বলেন, **'খোদার প্রিয় বান্দা নিজ প্রাণ খোদার রাস্তায় বিলীন করে আর এর বিনিময়ে সে খোদার সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়। তারাই সেসব লোক যারা খোদার বিশেষ রহমতের যোগ্যপাত্র'।**

এরপর খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **'প্রত্যেক মু'মিনের বাস্তব অবস্থা এমনই, সে যদি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হয়ে যায় তাহলে খোদা তা'লা তার ওলী বা বন্ধু হয়ে যান। কিন্তু যদি ঈমানের প্রাসাদ নড়বড়ে হয় তাহলে অবশ্যই ঝুঁকি থেকে যায়। আমরা কারো মনের অবস্থা জানি না। কিন্তু সে যখন নিখাঁদ খোদার হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা তার বিশেষ হিফাযত করেন। যদিও তিনি সকলের খোদা কিন্তু যারা একনিষ্ঠ তাদের উপর খোদা স্বীয় জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর খোদার জন্য একনিষ্ঠ বলতে যা বুঝায় তাহলো, আমিত্ব ও অহমকে**

এমনভাবে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলা যেন এর কোন কণাও অবশিষ্ট না থাকে। এজন্য আমি জামাতকে বারংবার বলি, বয়আত করাতেই গর্ব করো না। হৃদয় পবিত্র না হলে হাতে হাত রাখায় কী লাভ হবে। (অর্থাৎ বয়আতের জন্য হাত সামনে বাড়ানোয় কি লাভ) কিন্তু যে সত্য অন্তঃকরণে অঙ্গীকার করে তার বড় বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে এক নতুন জীবন লাভ করে।

এরপর ষষ্ঠ শর্ত হলো: 'কুসংস্কার এবং কু-প্রবৃত্তির অনুবর্তী হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম (সা.)-এর আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে'।

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা বলেছেন তা উল্লেখ করার পূর্বে আমি একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি বা কর্মপন্থার কোনটিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে (রসূলের আদেশ-এর কথা হচ্ছে) যে, মানুষ তা অনুসরণ আরম্ভ করে ফলশ্রুতিস্বরূপ সুন্নত প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তিও সুন্নত অনুসরণকারীর সমান প্রতিদান পাবে আর তার (প্রথম ব্যক্তি) প্রতিদানে কোন কমতি আসবে না। আর যে ব্যক্তি (ধর্মে) কোন বি'দাত বা নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটায় আর মানুষ তা অনুসরণ করে, তবে সে ব্যক্তিও বিদাত অনুসরণকারীদের পাপের অংশীদার হবে। আর সে বি'দাতে লিপ্ত লোকদের পাপ কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'দেখো! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন হবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যই একমাত্র পথ। এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই যা তোমাদেরকে খোদার সাথে মিলিত করবে। এক অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। শিরক্ ও বি'দাত এড়িয়ে চলা আবশ্যক। অভ্যাসের দাস ও কামনা-বাসনার পূজারী হওয়া অনুচিত। দেখো! আমি পুনরায় বলছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার পথ অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন পথে মানুষ সফল হতে পারে না। আমাদের কেবল একজনই রসূল রয়েছেন এবং এ রসূলের প্রতি একটিই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, যার অনুসরণে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। বর্তমানে পীর-ফকীরদের উদ্ভাবিত পথ, গদ্দীনশীন ও প্রভাবশালীদের অভিসম্পাত, দোয়া, দরূদ এবং ওযীফাহ্ সমূহ মানুষকে সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যম। অতএব তোমরা এসব এড়িয়ে চলো। এরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়ার মোহর ভঙ্গ করতে চায়, যেন নিজেদের পৃথক শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা স্মরণ রাখো! কুরআন শরীফ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশের আনুগত্য এবং নামায রোযা প্রভৃতি যেসব আবশ্যক কার্যক্রম রয়েছে, এগুলো ছাড়া খোদার কৃপা ও করুণাদ্বার উন্মুক্ত করার অন্য কোন চাবি নেই। সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট যে এসব পথ পরিত্যাগ করে নতুন কোন পথ উদ্ভাবন করে। সে ব্যক্তি ব্যর্থতা নিয়ে মরবে যে খোদা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর অধিনস্ত হয় না বরং অন্য পথে তাঁকে সন্ধান করে'।

অতঃপর সপ্তম শর্ত হচ্ছে: 'অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে'।

অহংকার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আমি সত্যি সত্যি বলছি, কিয়ামত দিবসে শির্কের পর অহংকারের ন্যায় বড় কোন পরীক্ষা বা আপদ আর নেই। এটি এমন এক আপদ যা উভয় জগতে মানুষকে ব্যর্থ করে। খোদা তা'লার কৃপা সব একেশ্বরবাদীর তদারক বা তত্ত্বাবধান করে, কিন্তু অহংকারীর নয়।** (আল্লাহ্ তা'লাকে মান্যকারী ও তাঁকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞানকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার করুণা নিজ ছায়ায় রাখে এবং তার গুণাহ্ সমূহ ক্ষমা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অহংকার ক্ষমা করেন না)। **শয়তানও একেশ্বরবাদী হবার দাবী করত। কিন্তু যেহেতু তার মাথায় অহংকার ছিল আর সে আদমকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলো, যে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রিয় ছিল এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করল, এজন্য সে ধ্বংস হল এবং অভিশাপের বেড়ি তার ঘাড়ে চাপানো হল। অতএব অহংকারই ছিল প্রথম সেই গুনাহ্ যেজন্য এক ব্যক্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।**

যদি তোমাদের কোন এক দিকেও অহংকার ও লোক দেখানো অভ্যাস থাকে বা আত্মশ্লাঘা থাকে বা অলসতা থাকে, তবে তোমরা খোদা তা'লার নিকট গ্রহণীয় হবে না। আমাদের যা কিছু করার তা করেছি! কেবল এমন কিছু বিষয় নিয়েই আত্মপ্রতারণায় মগ্ন হবে এমন যেন না হয় (বয়আত করেছি, এটিই যথেষ্ট)। **কেননা খোদা তা'লা তোমাদের ভেতর আমূল পরিবর্তন দেখতে চান। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান যার পর তিনি তোমাদেরকে পুনঃর্জীবিত করবেন'।**

এরপর মিসকিনদের সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেছেন, **'যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্ধান চাও তবে মিসকিনদের হৃদয়ের কাছে সন্ধান কর। এজন্যই নবীগণ মিসকিনের বেশে জীবন যাপন করেছেন। অনুরূপভাবে উচ্চ বংশের মানুষ নিম্নবংশের লোকদেরকে হাসি ঠাট্টা করাও অনুচিত। কেউ যেন একথা না বলে যে, আমার বংশ বড়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, তখন এ প্রশ্ন করা হবে না যে তুমি কোন বংশের সাথে সম্পর্ক রাখ? বরং প্রশ্ন করা হবে, তোমার কর্ম কেমন? অনুরূপভাবে খোদার নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে বলেছেন, "হে ফাতেমা (রা.)! খোদা তা'লা বংশ দেখবেন না। তুমি যদি কোন মন্দ কাজ কর তবে খোদা তা'লা তোমাকে এজন্য ক্ষমা করবেন না যে তুমি রসূলের কন্যা। অতএব, তুমি সর্বদা ভেবে চিন্তে কাজ কর।"**

অতঃপর অষ্টম শর্ত হচ্ছে: 'ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'ইসলামের জীবিত হওয়া আমাদের কাছে এক ফিদিয়া চায়। সেটি কি? সেটি হচ্ছে আমাদের এ পথে মৃত্যু বরণ করা। এ মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত। মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার জ্যোতির্বিকাশ এরই উপর নির্ভর করে। এটিই সেই জিনিস অন্য ভাষায় যার নাম ইসলাম। খোদা তা'লা এখন এ ইসলামকেই জীবিত করতে চান। সেই মহান অভিযান সফল করার জন্য নিজ সন্নিধান**

থেকে এক মহা কার্যক্রম জারি করা অবশ্যক ছিল যা সবদিক থেকে ফলপ্রসূ হবে। অতএব সেই প্রজ্ঞাময় ও সর্ব শক্তিমান খোদা এ অধমকে সৃষ্টির সংশোধনে প্রেরণ করে এমনটিই করেছেন'।

অতএব তাঁর (আ.) উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর সংশোধন করা। আমরা যারা তাঁর অনুসারী, আমাদের এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা আবশ্যক।

অতঃপর নবম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা সৎকর্ম খুবই পছন্দ করেন। তিনি চান, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। যদি তিনি পাপচার পছন্দ করতেন তবে পাপ করার তাকিদ করতেন, কিন্তু খোদা তা'লার মহিমা এর ঊর্ধ্বে। (সুবহানাহু তা'লা শানুহু)। অতএব, তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো, স্মরণ রেখো যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সে যে ধর্মেরই হোক না কেনো, সহানুভূতি প্রদর্শন কর। বিনা ব্যতিক্রমে সবার সাথে সদাচরণ কর। কেননা এটিই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা।** وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (সূরা আদ্ দাহ্‌র:৯) **যেসব বন্দীরা আসতো তাদের অধিকাংশই কাফির ছিল। ইসলামের সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখো। আমার মতে পূর্ণাঙ্গীন চারিত্রিক শিক্ষা একমাত্র ইসলামেই বিদ্যমান'।**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'আমার খুব কষ্ট হয় যখন আমি দেখি ও শুনি যে কেউ এ অপকর্ম করেছে কেউ সে অপকর্ম। আমি এসব বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমি জামাতকে এখনো সেই শিশুর ন্যায় মনে করি যে, হাটি হাটি পা পা করছে। কিন্তু আমি এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, খোদা তা'লা এ জামাতকে পূর্ণতা দান করবেন। এজন্য তোমরাও চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম ও দোয়ায় নিয়োজিত থাকো যেন খোদা তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন। কেননা তার করুণা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না। যখন তার করুণা বর্ষিত হয় তখন তা সকল পথ উন্মোচন করে'।**

তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'তাঁর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি নিজ জিহ্বা বা হাত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কারো প্রতি সে তোমার অধীন হলেও, অহংকার প্রদর্শন করো না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সাধু এবং জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু, কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ।** অনেকে এমন আছে যারা বাহ্যতঃ স্বচ্ছ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সাপের মত। **কাজেই তোমরা কখনো তাঁর সন্নিধানে গ্রহণীয় হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের ভেতর ও বাহির এক না হবে। বড় হয়ে ছোটদের স্নেহ কর তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়। যদি বিদ্যান হও তবে বিদ্যাহীনদের আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও তবে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ থেকে সাবধান থাকবে।'**

অতঃপর দশম শর্ত হচ্ছে: 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সব আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না'।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এ নবী সে সব বিষয়ে আদেশ দেয় যা বিবেক বিরোধী নয় এবং সেসব বিষয় থেকে বারণ করে যা বিবেক পরিপন্থী। পবিত্র জিনিস বৈধ করে এবং অপবিত্র জিনিস অবৈধ আখ্যায়িত করে। জাতির মাথা থেকে সেই বোঝা অপসারণ করে যার তলায় তারা চাপা পড়ে ছিল এবং সেই গলবন্ধ থেকে মুক্তি দেয় যার কারণে ঘাড় সোজা করে দাঁড়ানো সম্ভব হত না। অতএব যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আপন ভূমিকা রেখে তাকে শক্তি জোগাবে এবং সাহায্য করবে এবং সেই নূরের অনুসরণ করবে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে দুনিয়া ও পরকালের বিপদাবলী থেকে মুক্তি পাবে'।**

অর্থাৎ এগুলো শরীয়তের বিধি-নিষেধ। এগুলোই ন্যায়সঙ্গত বিধি-নিষেধ যা পালন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই পার্থিব বেড়ী থেকে এক ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব।

তিনি (আ.) বলেছেন, **'এখন আমার প্রতি ধাবিত হও কেননা এটিই সময়। যে ব্যক্তি আমার দিকে ধাবিত হবে, তাকে আমি সে ব্যক্তির সাথে তুলনা করি যে কোন প্রবল তুফানের সময় জাহাযে আরোহণ করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মানে না, আমি দেখছি যে সে নিজেকে ঝড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে কিন্তু তার কাছে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমি সত্যিকার শাফী** (মধ্যস্থতাকারী) **যে সেই বুযূর্গ শাফীর প্রতিচ্ছায়া** {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ছায়া} **এবং তাঁর প্রতিবিম্ব, যাঁকে সে যুগের অন্ধরা গ্রহণ করে নি এবং তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে পুনরায় বলেছেন, **'হে আমার প্রিয়গণ! আমার বন্ধুগণ! আমার সত্তারূপী বৃক্ষের সবুজ সতেজ শাখা সমূহ! যারা খোদা তা'লার কৃপায় আমার হাতে বয়আত করেছ এবং নিজ প্রাণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ এই পথে উৎসর্গ করেছ!** (এরপর কে তার প্রিয় তা স্পষ্ট করছেন) **আমার বন্ধু কে? এবং আমার প্রিয় কে? সে-ই যে আমাকে চেনে। আমাকে কে চেনে? সে-ই যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, আমি** (খোদা কর্তৃক) **প্রেরিত হয়েছি। সে আমাকে সেভাবে গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরিতরা গৃহীত হয়। পৃথিবীবাসী আমাকে কবুল করতে পারে না, কেননা আমি এ পৃথিবীর নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে পর জগতের অংশ দেয়া হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করে এবং করবে। যে আমাকে পরিত্যাগ করে সে তাঁকে পরিত্যাগ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে বন্ধন রচনা করে যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে একটি প্রদীপ আছে। যে আমার কাছে আসে সে অবশ্যই সেই আলোর অংশীদার হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে দূরে সরে যায় সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে। এ যুগের নিরাপদ ও সুরক্ষিত দুর্গ আমি** (আমি দৃঢ় ও

নিরাপদ দুর্গে রয়েছি) **যে আমাতে প্রবেশ করবে সে চোর ডাকাত ও হিংস্র প্রাণী হতে নিজের প্রাণ বাঁচাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে আমার চৌহদ্দি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে চতুর্দিক থেকে মৃত্যুর সম্মুখীন। তার লাশও নিরাপদ থাকবে না। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ পরিত্যাগ করে পুণ্য অবলম্বন করে আর বক্রতা পরিহার করে সততা ও সরলতা অবলম্বন করে এবং শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা (দাস) হয়ে যায়।প্রত্যেকে যে এমন করে সে আমাতে আর আমি তাতে। তবে কেবল সে-ই এমন করতে সক্ষম যাকে আল্লাহ্ এক পবিত্র আত্মার ছায়ায় আশ্রয় দেন। তখন সে তার নিজ অবাধ্য প্রবৃত্তির জাহান্নামে নিজের পা রাখে আর তা এমন শীতল হয়ে যায় যেন কখনো সেখানে আগুন ছিলই না।** (অর্থাৎ মানুষ যখন পাক-পবিত্র হয়ে যায় তখন নিজ প্রবৃত্তির নরকে পা রাখে বা যখন সে নিজকে পবিত্র করে তখন তার নফসের অগ্নি ঠান্ডা হয়ে যায়)। **তারপর সে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার মাঝে আল্লাহ্‌র রূহ বিরাজমান হয় এবং একটি বিশেষ জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বপ্রতিপালক তার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।** (অর্থাৎ তার আত্মায় আল্লাহ্ নিজ আরশ স্থাপন করেন) তখন তার ভেতরকার পুরনো মানুষটি জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় আর সেখানে একটি নতুন পবিত্র মানবাত্মা তাকে দান করা হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও নবরূপে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং বেহেশতী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ এ জীবনেই পেয়ে যায়।

অতএব এই হলো সেই শিক্ষা এবং সেই আকাঙ্খা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কার্যে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এবং প্রকৃতঅর্থে বয়আতকারীর মাপকাঠি হিসেবে এটিকে নির্ধারণ করেছেন। কাজেই আজকের দিনে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা আবশ্যক, আমরা এসব শর্তমোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করছি কি? আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। সেগুলো দূরীভূত করুন। আমাদের শক্তিদান করুন যেন আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনতে পারি। আমাদের মাঝে যদি কোন পুণ্য থাকে তাহলে তার মান যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্ যেন সেগুলোর মান উন্নত করার আমাদেরকে সুযোগ ও শক্তি দান করেন, যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হই।

আজ আমি সাবধাণতাবশতঃ পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু নোট সাথে রেখেছিলাম। আজ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এই সূত্র ধরে পাকিস্তানী আহমদীদের বলব, আপনারা দোয়া করুন। আজকাল পাকিস্তান যে অবস্থায় নিপতিত তা খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'লা এ দেশকে রক্ষা করুন, আহমদীদের খাতিরেই রক্ষা করুন কারণ আহমদীরা এদেশের অস্তিত্বের জন্য অনেক দোয়া করেছে। (তারপরও অনেক কিছু বলা হয়)। এজন্য আমি কতক উদ্ধৃতি এবং কিছু তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরবো যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহমদীরা এ দেশ গঠনের জন্য কতবড় ভূমিকা পালন করেছে।

'দওরে জাদীদ' নামে একটি পত্রিকা ছিল। তা ১৯২৩ সালের এক সংখ্যায় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব (রা.) সম্পর্কে লিখেছে। **'পাঞ্জাব কাউন্সিলের মুসলমানরা নিশ্চয়**

পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত হবার পূর্ণ অধিকার রাখে। এক সময় যখন প্রয়োজন পাঞ্জাবের পক্ষ থেকে একজন যোগ্য প্রতিনিধি ইংল্যান্ডে পাঠানোর প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের গুণ ও মান সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ল। তাই চৌধুরী (জাফরুল্লাহ্ খান) সাহেব নিজ খরচে লন্ডন যান আর এতো চমৎকারভাবে ও দক্ষতার সাথে ইংরেজ সরকার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সামনে (হিন্দুস্থানের) সমস্যাগুলো তুলে ধরেন যে, পাঞ্জাবের মুসলমানরাই কেবল এর প্রশংসা করেনি বরং সরকারও অনেকটা প্রভাবিত হয়েছে'।

এ হলো সে সব ঘটনা এবং এমন সমুজ্জ্বল বাস্তব ঘটনা যা কমপক্ষে সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। তারপর নামকরা সাহিত্যিকদের একজন মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর তাঁর 'হামদরদ' পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালের সংখ্যায় লিখেছেন: **'আমরা যদি এখানে এ কয়েকটি বাক্যে জনাব মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব এবং তাঁর সুসংহত জামাতের কথা উল্লেখ না করি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হবে যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের উর্দ্ধে থেকে নিজেদের পূর্ণ মনোযোগ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত করে রেখেছেন। সে সময় দূরে নয় যখন সুসংহত এই ইসলামী দলটির কর্মকান্ড মোটের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য আর বিশেষ করে সেসব ব্যক্তির জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা মসজিদে বসে ইসলামের সেবার অন্তসারশুন্য কিন্তু বড় বড় বুলি আওড়ায়'**। অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলী জওহর সাহেব আহমদীয়া জামাতের ভূমিকার কেবল প্রশংসাই করেছেন না বরং মুসলমান ফির্কা বলে গণ্য করেছেন। অথচ পাকিস্তানের ইতিহাসের পাতা থেকে বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের নাম বের করে ফেলার হীন চেষ্টা চলছে আর আইনের দিক থেকে তো এমনিতেই আমাদের মুসলমান বলে গণ্য করে না।

অনুরূপভাবে অপর একজন সম্মানিত সাহিত্যিক খাঁজা হাসান নিযামী সাহেব গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন, **'গোল টেবিল বৈঠকে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ সবাই চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁনের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষ যদি কেউ থেকে থাকে যিনি আদৌ কোন বাজে ও অনর্থক কথা বলেন না, বর্তমান যুগের জটিল রাজনীতিকে ভাল করে বুঝেন তাহলে তিনি হচ্ছেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁন।'** (মুনাদী পত্রিকা ২৪ অক্টোবর, ১৯৩৪ সালের সংখ্যা, সূত্র: পাকিস্তানের ইতিহাস ও জামাতে আহমদীয়া।)

তারপর ডাঃ আশেক হোসেন বাটালবী লিখেছেন, গোল টেবিল বৈঠকে মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে আগা খাঁন এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব সবচেয়ে সফল ব্যক্তি প্রমাণিত হয়েছেন। (সূত্র: ইকবালের শেষ দুই বছর, প্রকাশক: ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান।)

স্বয়ং কায়েদে আযম নিজের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তণ এবং হিন্দুস্তানে ফিরে আসা সম্পর্কে লিখেছেন: **'আমি অনুভব করছিলাম যে, আমি হিন্দুস্তানের কোন সাহায্য করতে পারব না।** (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দুস্তান ছেড়ে যখন লন্ডন চলে যান সে সময়কার কথা) **হিন্দু মন-মানসিকতায়ও ইতিবাচক কোন পরিবর্তন আনতে পারব না আর না-ই মুসলমানদের চোখ খুলতে পারব তাই অবশেষে লন্ডনে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলাম।'** এ কথা

রইস জাফরী সাহেবের বইতে লেখা আছে। তখন আহমদীয়া জামাত তাকে হিন্দুস্তান ফেরত আনার চেষ্টা করেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লন্ডন মসজিদের ইমাম মওলানা আব্দুর রহীম দরদ সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন, হিন্দুস্তানে ফেরত এসে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের মানসে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কায়েদে আযমের উপর চাপ সৃষ্টি করো। অবশেষে কায়েদে আযম হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং মুসলমানদের সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করতে সম্মত হন এবং অবলিলায় তিনি বলেন, The eloquent persuasion of the Imam left me no scope. অর্থাৎ লন্ডন মসজিদের ইমামের এমন সাবলিল এবং সুগভীর প্রেরণা ও জোরালো সদুপদেশের সামনে আমার জন্য না বলার আর কোন সুযোগ ছিল না।"

তারপর 'মীম সীন' নামে পরিচিত প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ শফি সাহেব লিখেছেন, একমাত্র জনাব লিয়াকত আলী খাঁন এবং মওলানা আব্দুর রহীমই জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেশে ফেরত এসে জাতীয় রাজনীতিতে স্বীয় ভূমিকা পালনে সম্মত করেন। যার ফলে জিন্নাহ্ সাহেব ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্তানে ফেরত আসেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। (সূত্র দৈনিক পাকিস্তান টাইম, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত)

যারা কঠোর বিরোধী ছিলেন তারাও একটি কথা স্বীকার করেছেন। "মুসলিম লীগ আওর মির্যাইওঁকী আঁখ মাচোলী পার তাবসেরা" নামে আহরারীরা ১৯৪৬ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, যাতে খুব স্পষ্ট করে লিখেছে, **'জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কোয়েটায় বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি মির্যা মাহমুদ সাহেবের (আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা) মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়ার নীতির প্রশংসা করেছেন। তারপর কেন্দ্রীয় মধ্যম নির্বাচন শুরু হলে মির্যায়ীরা (আহমদীরা) সবাই মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল।'**

প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম মৌলভী মীর ইব্রাহিম শিয়ালকোটী নিজ বই "পয়গামের হিদায়েত ও তাঈদে পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগ" এ লিখেছেন, **'আহমদীদের ইসলামী পতাকাতলে এসে যাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, সত্যিকারঅর্থে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র দল'**। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আহমদীরা মুসলমান এবং পাকিস্তান গঠনে তারা গুরু দায়িত্ব পালন করেছে।

বাউন্ডারী কমিশনের সামনে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব অনেক বড় (পাকিস্তানের পক্ষে) অবদান রেখেছেন । তার এই খিদমত সম্পর্কে তখনকার দৈনিক "নাওয়ায়ে ওয়াকত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হামীদ নিযামী সাহেব বড় জোরালো ভাষায় লিখেছেন। অথচ আজকাল নাওয়ায়ে ওয়াকত আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখে থাকে, তাদের পলিসি বদলে গেছে। কারণ তারা ইহজাগতিক লাভের সন্ধানে আছে।

'বাউন্ডারী কমিশনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেল। চারদিন যাবত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণ সমৃদ্ধ অতি

জ্ঞান-গর্ভ এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বিতর্ক করেছেন। সাফল্য দান করা আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু যত সুন্দরভাবে ও দক্ষতার সাথে স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব মুসলমানদের মামলা পরিচালনা করেছেন তা থেকে মুসলমানরা অবশ্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, তাদের পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবী যথাযথ ও সর্বোত্তমভাবে ক্ষমতাসীনদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। স্যার জাফরুল্লাহ্ খাঁন মামলার প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় পেয়েছেন। কিন্তু আন্তরিকতা ও যোগ্যতার কারণে তিনি অতি উত্তম ভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা নিশ্চিত, পাঞ্জাবের সকল মুসলমান, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য ভুলে গিয়ে তার অবদান স্বীকার করবে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে'।

১৯৫৩ সালের দাঙ্গা চলাকালে আমাদের জামাতের বিষয়টি তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থাপিত হলো। বিচারপতি মুনীর জজ ছিলেন। তিনি লিখেন, **'আহমদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বাউন্ডারী কমিশনের সিদ্ধান্তে গুরুদাসপুরকে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হলো আহমদীদের বিশেষ ভূমিকা। অর্থাৎ চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন ঐ কমিশনের সামনে বিশেষ ধরনের যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিলেন যাকে কায়েদে আযম মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই আদালতের প্রেসিডেন্ট (বিচারপতি মুনীর) যিনি ঐ বাউন্ডারী কমিশনের সদস্য ছিলেন (সে সময় বাউন্ডারী কমিশনে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের সাথে ছিলেন) সেই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করে যা গুরুদাসপুরের জন্য তিনি প্রদর্শন করেছেন। এই বাস্তব সত্যটি বাউন্ডারী কমিশন কর্মকর্তাদের কাগজপত্রে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। এ বিষয়ে যে আগ্রহ রাখে সে স্বানন্দে সেই রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে পারে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁন মুসলমানদের অত্যন্ত নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন কোন জামাত তদন্ত আদালতের সামনে যেভাবে তার উল্লেখ করেছে তা অত্যন্ত লজ্জাষ্কর ও অকৃতজ্ঞতার শামিল'।**

অধিকাংশ রাজনৈতীক দলের এই লজ্জাষ্কর অকৃজ্ঞতা এখন বেড়েই চলেছে। দেশের অবস্থা সবার সামনে স্পষ্ট। তাই আজ এ দিনের (অর্থাৎ ২৩ মার্চ) প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানীরা স্বদেশের জন্য অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা একে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন যেদিকে দেশটি অগ্রসর হচ্ছে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)